Loka Kalyan Parishad

পরিবেশমূখী প্রাকৃতিক সম্পদ

ব্যবহারের সহজ পাঠ

৩

মহিলা কিষাণ সশক্তিকরণ পরিযোজনা

(CRP ও মহিলা কিষাণদের জন্য প্রশিক্ষণ সহায়িকা)

লোক কল্যাণ পরিষদঃ ২৮/৮, লাইব্রেরী রোড, কলকাতা – ৭০০ ০২৬, ফোনঃ ০৩৩ – ২৪৬৫ ৭১০৭ / ৪০৬০৫০৩৬ / ৬৫২৯১৮৭৮

Email: lkpmksp2013@gmail.com, lkp@lkp.org.in, lokakalyanparishad@gmail.com, Website: http://www.lkp.org.in

ভূমিকা

মাটি জীব জগতের ভিত্তি, উদ্ভিদ সরাসরি মাটির উপর নির্ভরশীল- মাটি থেকেই বেশীর ভাগ পুষ্টি সংগ্রহ করে। আর প্রাণীকুল বেঁচে থাকার জন্য, খাবারের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। কাজেই মাটির স্বাস্থ্যের উপর উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের স্বাস্থ্য নির্ভর করে।

কোটি কোটি বছরের বিবর্তনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে মাটি। বয়ে এসেছে প্রাণী জগতের ধারা মাটির উপর ভিত্তি করে। কিন্তু বর্ত্তমানে মানুষের লোভ ও অজ্ঞানতার ফলে মাটি হয়ে পড়েছে দুর্বল। সৃষ্টিকে সুস্থায়ী, টেকসই করতে হলে মানুষেরই দায়িত্ব নিতে হবে। শিখতে হবে সুষ্ঠ, পরিবেশমূখী মাটির ব্যবহার। বুঝতে হবে মাটির জীবন।

এই পুস্তিকাতে মাটিকে বোঝার ও সুস্থায়ী ব্যবহারের ভাবনা ও কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ভারত সরকার ও পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য সরকারের অন্তর্গত 'আজীবিকা মিশন' ও 'আনন্দধারা'-র যৌথ উদ্যোগে 'মহিলা কিষাণ সশক্তিকরণ পরিযোজনা' প্রকল্পটি লোক কল্যাণ পরিষদ সারা রাজ্যের ৫টি জিলা, ১১টি ব্লক ও ৫০টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ৬০ হাজার মহিলা কিষানদের সাথে নিয়ে রূপায়িত করছে। এই প্রশিক্ষণ সহায়িকা-টি প্রকল্পভূক্ত মহিলা কিষাণ সম্প্রদায় ও তৃনমূল স্তরের প্রশিক্ষণ কর্মী সি.আর.পি / পি.পি. –দের জন্য ব্যবহৃত হবে।

অমলেন্দু ঘোষ

সম্পাদক

লোক কল্যাণ পরিষদ

মহিলা কিষাণ সশক্তিকরণ পরিযোজনা (MKSP)

একটি জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন (NRLM) এর উপপরিকল্পনা

গ্রামীণ কৃষক পরিবারের মহিলাদের 'মহিলা কিষাণ' হিসাবে সামাজিক পারিবারিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও জীবিকার উন্নয়ন।

উন্নয়ন উদ্যোগের প্রক্রিয়াঃ

ক) 'মহিলা কিষাণ' সংগঠিত হবেন এবং যৌথ সিদ্ধান্ত নেবেন –স্থানীয় ব্যবহারযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদগুলি কিভাবে ব্যবহার করবেন এবং কি ধরনের উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তুলবেন।

খ) খরা প্রবণ অঞ্চলের উপযুক্ত বৃষ্টি নির্ভর ও সুস্থায়ী কৃষি ব্যবস্থাপনাঃ যেমন – কম জলের ফসল চক্র, অপ্রচলিত উপযুক্ত বহুবর্ষজীবী ফসল, উপযুক্ত ঐতিহ্যপূর্ণ বনেদী ফসলগুলির পুনঃপ্রচলন, ডাল ও তেলবীজ ইত্যাদির উৎপাদন, প্রচার, প্রসার ও প্রচলনের সহায়তা।

গ) চাষকে সুস্থায়ী করার লক্ষ্যে নিবিড়, বহুমূখী ও সুসংহত (Integrated System) প্রযুক্তির ব্যবহারে সহায়তা করা।

ঘ) সরকারি, বেসরকারি জলাভূমি, জমি ইত্যাদিতে অংশীদারির ভিত্তিতে দলগুলিকে যৌথ চাষ ব্যবস্থার প্রচার ও প্রসার ঘটানোয় নিয়োজিত করা।

ঙ) খাদ্য দ্রব্য সংরক্ষণ, মূল্যমান বাড়ানো ও ব্যবসায়ের মাধ্যমে আয় বাড়ানোর উদ্যোগে একটি স্থিতিশীল উপযুক্ত বাজার ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

উক্ত প্রক্রিয়াগুলির সঠিকভাবে সম্পাদনার ফলে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্ত্বার সাথে সাথে মহিলা কিষাণের আয় বাড়ানো সম্ভব হবে।

উন্নয়ন উদ্যোগের বিষয় ভিত্তিক কৌশলঃ

ক) মাটি ও জমির স্বাস্থ্য উদ্ধার ও উন্নয়ন

- ✓ জমির আল বাঁধা, পুকুরের পাড় বাঁধা ও ব্যবহার যোগ্য করা, সারা বছর ভূমির উপর জৈব ও ফসলের ঢাকনা, মাল্‌চের ব্যবহার ইত্যাদি
- ✓ জমির নিকাশী ব্যবস্থার উন্নয়ন
- ✓ খামারের বর্জ্য পুনর্নবিকরণ ও ব্যবহার, সবুজ সার, জৈব সার ইত্যাদির ব্যবহার বাড়ানো
- ✓ শস্য পর্যায়ে ডাল জাতীয় ফসলের অন্তর্ভুক্তি

খ) ভূমি ও জল সংরক্ষণ – ১০০ দিনের কাজের মাধ্যমে উন্নয়ন

- ✓ জমির সমোন্নত আলে ফসলের ঢাকনা, উৎপাদন
- ✓ জমির সমোন্নত আল তৈরি, আল শক্তপোক্ত করা
- ✓ মজা জলাশয় উদ্ধার ও নতুন জলাশয় খনন
- ✓ মাঠ কুয়া, শোষক কুয়া, (সোক পিট), জলধারণ ব্যবস্থা তৈরি

গ) ব্যয় সাশ্রয়কারী সুস্থায়ী চাষ প্রযুক্তি

- ✓ ভেষজ কীটনাশক দ্বারা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
- ✓ রাসায়নিক সার, বীষের ব্যবহার কমিয়ে ক্রমান্বয়ে বন্ধ করা
- ✓ জৈব সার, জীবাণু সার উৎপাদন ও ব্যবহার বাড়ানো – আয় করা

ঘ) ঝুঁকিপূর্ণ, বিপদজনক কাজের বিকল্প

- ✓ বিষমুক্ত চাষ ও খাদ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা
- ✓ রাসায়নিক বিষের পরিণতি সম্পর্কে সচেতন করা, মুখোস, হ্যান্ড গ্লাভ্‌স, যন্ত্র ইত্যাদির ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করা

ঙ) জীব বৈচিত্র সুরক্ষা – সচেতনতা বৃদ্ধি ও অনুশীলন

- ✓ পছন্দ সই, উপযুক্ত বনেদী ফসলের প্রচলন, পুনঃপ্রচলন
- ✓ মহিলা কিষাণের দলীয় বীজ ভাণ্ডার তৈরি, প্রসার – কন্দ, মূল, ছোট দানা শস্য ইত্যাদি

চ) পরম্পরাগত জ্ঞান ও কৌশলের প্রসার ও প্রচার

- ✓ মহিলা কিষাণদের জন্য পরম্পরাগত সুস্থায়ী চাষের পরিবেশ সম্পর্কে অনুশীলন
- ✓ বহুতল চাষ ব্যবস্থাপনা, বহুমূখী সুস্থায়ী চাষ ব্যবস্থাপনা – অনুশীলন, প্রচার ও প্রসার

ছ) পরিবেশ পরিবর্তন, উষ্ণায়ণ ইত্যাদি নিরসনে বহুমূখী প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার প্রচার ও প্রসার

- ✓ কৃষি ভিত্তিক বনসৃজন – রাস্তা, খাল, নদী, রেল পাড়, পতিত জমি ইত্যাদিতে কিষাণ বন (ফল, পশুখাদ্য, জ্বালানী, সার উৎপাদনকারী, আসবাবী বৃক্ষাদি) তৈরি

জ) উপরোক্ত বিবিধ কার্যক্রম বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মসূচীর সঙ্গে মহিলা কিষাণদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জীবন ও জীবিকার মান উন্নত করা

ঝ) সমস্ত কার্যক্রম পরিচালনা ও প্রসারের জন্য উপযোগী প্রতিষ্ঠান সমূহ তৃণমূল স্তর থেকে জেলা স্তর পর্যন্ত নিবিড়ভাবে সক্রিয় করা

সূচীপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১	তরল সার	৩
২	কম্পোস্ট	৫
৩	ভার্মি কম্পোস্ট	৮
৪	সবুজ সার	১৩
৫	সবুজ পাতা সার	১৪
৬	গোবর গ্যাস স্লারি	১৫
৭	এজোলা দিয়ে ধান ক্ষেতের উর্বরতা বাড়ান	১৭
৯	ফসফো কম্পোস্ট	১৯

লোক কল্যাণ পরিষদঃ ২৮/৮, লাইব্রেরী রোড, কলকাতা – ৭০০ ০২৬, ফোনঃ ০৩৩ – ২৪৬৫ ৭১০৭ / ৪০৬০৫০৩৬ / ৬৫২৯১৮৭৮

Email: lkpmksp2013@gmail.com, lkp@lkp.org.in, lokakalyanparishad@gmail.com, Website: http://www.lkp.org.in

তরল সার

কি ?

তরল সার ক্ষুদ্র অণুজীবের দ্বারা তৈরী একটি জৈব সার যা সব্জী, ফসল ও গাছপালাগুলির নিয়মিত বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

কেন তৈরী করবেন ?

সব্জী বাগানে গাছপালা লাগানোর পর নিয়মিত তাদের কিছু খাবার যোগান দেওয়াটা দরকারী। রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার যেমন ব্যয়বহুল ঠিক সেরকম স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারকও বটে। তাই এসব ব্যবহারের পরিবর্তে বাড়িতে জৈব সার বানিয়ে গাছে দিলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, রোগ পোকার আক্রমণও অনেক কমে গিয়ে রোগমুক্ত পুষ্টিকর ফসল পাওয়া যাবে। বিভিন্ন জৈবসার সমূহের মধ্যে তরল সার একটি অত্যন্ত উৎকৃষ্ট সার যা সব্জী বাগানে খুবই দরকারী। এটি ফসলের টনিক হিসাবে কাজ করে। এরমধ্যে পুষ্টি বস্তু (nutrients) অল্প পরিমাণে থাকে কিন্তু সেগুলি সহজলোভ্য তাই তাড়াতাড়ি কাজ দেয় এবং এর ভিতরে যেসব লাভজনক অণুজীবগুলি থাকে, তারাও মাটি কে উবর্বর করে।

কি উপকরণ প্রয়োজন ?

এই তরল সার বানানোর জন্য দামী কোনো জিনিসপত্রের প্রয়োজন হয় না, যেগুলি দরকার লাগে সেগুলি হল একটি ড্রাম বা বড় মাটির জালা, জল, গভীর শিকড়যুক্ত স্থানীয় আগাছার (আগাছাটি শুঁটিজাতীয় ও গন্ধযুক্ত হলে ভালো হয়) সবুজ পাতা, গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগী ইত্যাদির বিষ্ঠা বা মল; একটি চটের বস্তা ও একটি লাঠি।

কিভাবে তৈরী করবেন ?

প্রথমে যতটা পরিমাণ আগাছা ও সবুজ গন্ধযুক্ত কিংবা শুঁটিজাতীয় পাতা নেবেন ঠিক ততটা পরিমাণ গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী ইত্যাদির বিষ্ঠা বা বর্জ্য পদার্থ নেবেন। এবারে ভালো করে এগুলি মেশাবেন ও মিশ্রণটি একটি বস্তায় ভরে, ওই চটের বস্তার মধ্যে ইঁট, পাথর বা ভারি কিছু দিয়ে বস্তার মুখ বন্ধ করে জালা বা ড্রামের ভিতর রাখুন (জালা, ড্রাম বা হাঁড়ির মুখ ছোট হলে প্রথমে এই পাত্রের মধ্যে চটের বস্তা দিয়ে তার মধ্যে ভারি কিছু রেখে ওই মিশ্রণগুলি দিয়ে বস্তার মুখ বন্ধ করুন)। চটের বস্তাটি যাতে ডুবে থাকে সেইজন্য ইঁট, পাথর বা ভারি কিছু দেওয়া হয়ে থাকে। তারপর পাত্রের মধ্যে পাতা ও বিষ্ঠার পরিমাণের/আয়তনের ২০ গুণ জল ঢেলে দিন (অর্থাৎ বিষ্ঠার পরিমাণের ২০ গুণ)।

জালা বা ড্রামটির মুখ একটি মাটির ঢাকনা দিয়ে ঢেকে হালকা ছায়াযুক্ত স্থানে রাখবেন। পাত্রটিতে যেন সরাসরি রোদ না লাগে। নিয়মিত দুবেলা ওই মিশ্রণটি লাঠি দিয়ে নাড়বেন। মিশ্রণটি লাঠি দিয়ে পর্যায়ক্রমে ডান ও বাম দিকে ঘোরাবেন, যাতে পাত্রটির মধ্যে পর্যাপ্ত অক্সিজেনের সরবরাহ থাকে। তিন সপ্তাহের মাথায় এক কাপ ঝোলা গুড় মেশাতে পারলে, তরল সার আরও ভালো হয়। বিশেষত নার্সারীতে ব্যবহারের জন্য তৈরী তরল সারে গুড় মেশানো ভালো।

এইভাবে তিন থেকে চার সপ্তাহ বাদে সারটি তৈরী হয়ে যাবে।

কিভাবে বুঝবেন সারটি তৈরী হয়েছে ?

- তৈরী সারে কোনো দুর্গন্ধ থাকে না।
- সারটি দেখতে কালচে সবুজ রং-এর হবে।

ব্যবহার কিভাবে করবেন ?

তরল সার যতটা নেবেন তার সমপরিমান জল মিশিয়ে নেবেন। এবার এটি গাছের পাতায় ঘড়ের নুড়ি বা ঝাঁটার সাহায্যে ছিঁটিয়ে বা স্প্রে দিতে হবে। গাছের গোড়ায় জল না মিশিয়ে সরাসরি দিতে হবে। এই তরল সার সকালে বা বিকেলের দিকে গাছে প্রয়োগ করা উচিত।সপ্তাহে ২-৩ বার তরল সার গাছে দিলে গাছ খুব সতেজ ও ভালো হয়। সাধারণভাবে সপ্তাহে ১ লিটার তরল সার ১ বর্গমিটার (প্রায় ২হাত ক্রঃ২হাত) জায়গার গাছগুলির জন্য প্রয়োজন হয়।

- তরল সার সাধারণভাবে ঘরোয়া সব্জীর বাগান, পান বরজে বিশেষ কার্যকরী।
- সব্জী, ফসল ইত্যাদির বীজ তরলসারে ২/৩ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছায়ায় শুকিয়ে রোপণ করলে ভালো অঙ্কুরোদগম হবে।
- ৫-৬ সপ্তাহ পর্যন্ত এই তরল সারের গুণাগুণ বজায় থাকতে পারে। তারপরেও ব্যবহার করা যেতে পারে তবে গুণমান কমে যায়। বস্তার ভিতরে থাকা পাতাগুলি পুনরায় কম্পোস্টে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়, কিংবা এগুলিকে মাটির ওপর মাল্চ (আচ্ছাদন) হিসাবে ব্যবহার করা যায়। এতে গাছের খাদ্য সরবরাহ ভালো হবে ও গাছের বৃদ্ধি হবে সঠিক।

সতর্কতা :

১) তরল সার পাতায় প্রয়োগ করলে সমপরিমান জলের সাথে মিশিয়ে নিতে হবে, মাটিতে দিলে সরাসরি প্রয়োগ করতে পারেন।

২) অবশ্যই পাত্রটির মুখ ঢাকা দিয়ে রাখবেন কারণ সারটি তৈরী হবার সময় দুর্গন্ধ হয়। মশা মাছির সম্ভাবনা থাকে৷

৩) প্রতিদিন না নাড়ালে ভালো সার তৈরী হবে না। সুতরাং নাড়াটা খুব জরুরী।

৪) নিম-এর পাতা মেশাবেন না, সার তৈরী হতে সময় বেশী লাগবে।

৫) ইউক্যালিপটাস ও সোনাঝুরির পাতাও মেশাবেন না।

তথ্য সার্ভিস সেন্টার কলকাতা

কম্পোস্ট

বিভিন্ন জৈব পদার্থ বা আবর্জনা পচিয়ে যে সার পাওয়া যায় তাকে কম্পোস্ট সার বা আবর্জনা সার বলে। এই সারে কম পরিমাণে হলেও প্রায় সব রকম উদ্ভিদ খাদ্য গ্রহণযোগ্য অবস্থায় থাকে যা গাছের বৃদ্ধির জন্য খুবই দরকারী। সার তৈরীর পদ্ধতি খুব সহজ এবং সার তৈরীর উপাদানগুলি সর্বত্রই যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। এই সার ব্যবহার করলে মাটির স্বাস্থ্য ভাল থাকে ও দীর্ঘদিন ধরে এই মাটি থেকে ফসল পাওয়া যায়। মাটি জীবন্ত হয়ে ওঠে এবং তার জলধারণ ক্ষমতা বাড়ে। মাটি ফুসফুসে ও আলগা হয় বলে মাটির ভিতর বাতাস চলাচল করে, উপকারী জীবাণ-বীজানু-গাছের শিকড়ের শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়ার সুযোগ বাড়ে ও মাযির নিকাশী ব্যবস্তা ভাল হয়।

কম্পোস্ট তৈরী করতে সাধারণত দু'ধরণের পদার্থ দরকার হয়।

১) **শুকনো জৈব বস্তু (কাবন সমৃদ্ধ বস্তু)** - খড়, শুকনো পাতা, সরষে গম, তিল, ভুট্টা ইত্যাদির শুকনো কান্ড, তুষ, বিভিন্ন শস্যের শুকনো অবশিষ্টাংশ, সুপুরির খোলা ইত্যাদি। এইসব বস্তুর থেকে প্রচুর জৈব কার্বন পাওয়া যায়। মাটিতে বসবাসকারী যেসব জীবাণু জৈব বস্তু পচনে সাহায্য করে, সেইসব জীবাণুর খাদ্য হিসেবে এই জৈব কার্বন কাজে লাগে।

২) **কাঁচা জৈব বস্তু (নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ বস্তু)** -কাঁচা গোবর, হাঁস-মুরগী বা ছাগলের বিষ্ঠা, আনাজের খোসা, কাঁচা পাতা, (শুটিজাতীয় গাছের হলে ভাল) শিকড় কাটা কুরিপানা (কচুরিপানার শিকড় সারে পরিণত হতে দেরী হয়), আগাছা ইত্যাদি। এইসব বস্তু দেওয়ার ফলে জৈব নাইট্রোজেন পরিমাণ বাড়ে। কাঁচা জৈব বস্তুগুলি পচনে সাহায্যকারী জীবাণুর খাদ্য হিসেবেও কাজে লাগে।

কম্পোস্ট তৈরীর পদ্ধতি

১) আধো ছায়া জায়গা যেখানে জল দাঁড়ায় না, সেইখানে কম্পোস্ট তৈরী করা উচিত। বেশী বৃষ্টি ও রোদ থেকে বাঁচাতে হালকা ছাউনি দিতে হয়।

২) কম্পোস্ট গর্ত বা ঢিপি দইু পদ্ধতিতে করা যায়। গর্ত করলে গর্তের গভীরতা ৩ ফুটের (মোটামুটি দইু আড়াই হাত) বেশী হওয়া উচিত নয়। চওড়া ৫-৬ ফুট (সাড়ে তিন থেকে চার হাত) এবং প্রয়োজনমত ভর্তটি লম্বা করা যেতে পারে। ঢিপি করলে ঢিপিটি মাটি থেকে ৫ ফুট (সাড়ে তিন হাত) উঁচু করা যাবে। গর্তের গভীরতা বাড়ালে সার পচতে দেরী হয়।

৩) গর্তের তলার ইঁট, পাথর বা বাঁশ বিছিয়ে দিতে হবে। ঢিপি হলে মাটির ওপরেই এই সমস্ত বস্তু দিয়ে ঢিপির নীচটা তৈরী করতে হবে। ঢিপি কম্পোস্টের জন্য বাঁশের বেড়া দিয়ে মাপ মতো খাঁচা বানিয়ে নিলে সুবিধে হয়।

৪) দুই পদ্ধতিতেই ৩:২:১ অনুপাতে শুকনো, কাঁচা জৈব বস্তু ও মাটি নিতে হবে। অর্থাৎ ৩ ঝুড়ি খড় বা শুকনো পাতা নিলে ২ ঝুড়ি গোবর বা কাঁচা পাতা (অথবা গোবর আর কাঁচা পাতা একসাথে মিশিয়ে)

এবং ১ ঝুড়ি মাটি নিতে হবে। অল্প পরিমাণ গোবর, পশুপাখীর মল অবশ্যই নিতে হবে। গোবর, অন্য প্রাণীর বিষ্ঠা ইত্যাদি পরিমাণে কম থাকলে যেটুকু গোবর বা বিষ্ঠা পাওয়া যাবে, অন্তত সেটুকুই জলে গুলে শুকনো লতাপাতার ওপর ছিটিয়ে ভিজিয়ে দিতে হবে।

৫) প্রথমে তিন ঝুড়ি খড়, শুকনো পাতা, তুষ ইত্যাদি দিতে হবে। এইসব শুকনো বস্তুর স্তরটি গোবর বা অন্য প্রাণীর বিষ্ঠা গোলা জল (গোবর বা বিষ্ঠা কম পাওয়া গেলে তরল সার বা শুধু জল) দিয়ে ভিজিয়ে দিতে হবে। এই স্তরটির ওপর দু' ঝুড়ি গোবর, কাঁচা পাতা বা হাঁস-মুরগীর বিষ্ঠা দিতে হবে এবং একদম শেষে এক ঝুড়ি হালকা মাটির স্তর সাজাতে হবে। এইভাবে স্তরে স্তরে পুরো গর্তটি ভরাট হলে (প্রয়োজনমেতা মাটির ওপরে ৫ ফুট পর্যন্ত উঁচু করা যায়) অথবা ঢিপির ক্ষেত্রে ৫ ফুট উচ্চতা পর্যন্ত স্তরে স্তরে সাজানো হয়ে গেলে দুটি ক্ষেত্রেই মাটির সাথে ছাই ও গোবর সামান্য জল মিশিয়ে চারপাশ ও উপর দিক লেপে দিতে হবে।

৬) কয়েকটি বাঁশ চিরে গাঁটগুলো চেঁছে ফেলে দিয়ে ফের জোড়া করে বেঁধে পাইপের মতো করতে হবে। বাঁশটির গায়ে কয়েকটি ছিদ্র করে দিতে হবে। এবার বাঁশটি মাঝখানে রেখে স্তরে স্তরে বস্তুগুলি সাজাতে হবে। এর মধ্যে দিয়ে দূষিত গ্যাস বেড়িয়ে যেতে পারে এবং হাওয়া চলাচল করতে পারে যা বস্তুগুলির পচনের জন্য জরুরী।

৭) কম্পোস্টের গর্তে বা ঢিপিতে যাতে সরাসরি রোদ বা বৃষ্টির জল না ঢোকে সেইজন্য কম্পোস্ট গর্ত বা ঢিপির ওপর একটি ছাউনি তৈরী করা দরকার ও চারপাশে আল বেঁধে রাখা দরকার।

৮) কম্পোস্ট তৈরী শুরু করার ১ মাসের মাথায় সমস্ত বস্তুগুলি একটু উল্টে পাল্টে ও ভিজিয়ে দিয়ে আবার মাটি দিয়ে লেপে দিলে ভালো হয়। এইভাবে করলে আড়াই থেকে তিন মাসের মধ্যেই কম্পোস্ট তৈরী হয়ে যায়।

কম্পোস্ট তৈরী হয়েছে কিভাবে বোঝা যাবে

১) গর্তে বা ঢিপির ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিলে উত্তাপ অনুভব হবে না।

২) কম্পোস্টে কোনও দুর্গন্ধ থাকবে না, এক ধরণের সোঁদা সোঁদা গন্ধ থাকবে।

৩) তৈরী কম্পোস্টে কয়েকটি শুষ্ক কাঠির টুক্‌রো ছাড়া প্রথমে ব্যবহৃত বস্তুগুলির আর কোনও অস্তিত্ব থাকবে না।

৪) কম্পোস্ট দেখতে গাঢ় বাদামী বা কালো রঙের ঝুরঝুরে হবে।

কিভাবে ব্যবহার করবেন

শেষ চাষের সময় মাটির সাথে মিশিয়ে দেবেন। ক্ষেতের ওপর বিভিন্ন জায়গায় ঢিপি করে ফেলে রাখবেন না বা আগেই ছড়িয়ে দেবেন না। এত এই সারের গুণাগুণ অনেকটা নষ্ট হয়ে যায়। শেষ চাষ দিতে দেরী থাকলে জমির এক কোণে পুরো কম্পোস্ট ঢিপি করে খড় বা চটের বস্তা দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। পরিমাণে অল্প হলে বর্ষার মরশুমে চাষের সময় কম্পোষ্ট ব্যবহার করা ভালো।

বিশেষ করে মনে রাখতে হবে

- কম্পোস্ট গর্ত বা ঢিপি যেন খুব রোদ বা খুব ছায়াতে না থাকে।
- কম্পোস্টের মধ্যে বা তলায় জল জমা উচিত নয়, কিন্তু উপকরণের মধ্যে ৭০-৮০% আদ্রতা বজায় রাখতে হবে।
- নির্দিষ্ট আদ্রতা বজায় রাখশর জন্য প্রয়োজনে লেপে দেওয়া কাদার আন্তরণের কয়েক জায়গায় একটু ফাঁকা

করে ২-৩ সপ্তাহ পর পর জল দিয়ে (৯-১০ বর্গফুট জায়গার জন্য ৪-৫ লিটার হিসেবে) আস্তরণ আবার মেরামত করে দিতে হয়। বিশেষ করে ঢিপি কম্পোস্ট আদ্রতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে বিশেষ নজর রাখতে হবে।

- জৈব উপাদানগুলি কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ব্যবহার করা ভালো। তাড়াতাড়ি সার তৈরী হয়।
- কিছু পরিমাণ রক ফসফেট ও উনুনের ঠান্ডা ছাই কম্পোস্টে দওয়া ভালো।

চট-জলদি কম্পোস্ট তৈরী

১। উদ্ভিদের সবুজ এবং শুকনো অংশগুলি ভালোভাবে টুক্‌রো করুন।

২। সমপরিমাণে পশুপাখীর টাট্‌কা মলমূত্র এর সাথে মেশান।

৩। এবার এই মিশ্রণটিকে ১ মিটার লম্বা ও চওড়া জায়গায় ১ মিটার উঁচু করে সাজিয়ে রাখুন (এটাই সর্বোচ্চ মাপ)।

৪। গাদাটিকে প্লাস্টিক চাদর বা সারের বস্তা দিয়ে, কলাগাছের পাতা দিয়ে ঢেকে দিন।

৫। ৩-৪ দিনে কম্পোস্ট গাদার ভেতরটা গরম হবে। যদি গরম ঠিকমত না হয় তাহলে আরও প্রাণীজ সার মেশান।

৬। সেইদিনই পুরো গাদাটাই ওলট পালট করে দিন যাতে করে সমগ্র অংশটাই ঠিকমত পচতে পারে।

৭। তার দুদিন পরে আবার মিশ্রণটি ওলট পালট করে দিন।

৮। ১৪-১৮ দিনের মধ্যে কম্পোস্ট ব্যবহার করা যাবে।

৯। জলাশয়ের আগাছা, কচুরীপানা এ কাজে লাগালে খুব ভালো সার হয়।

তথ্য সার্ভিস সেন্টার কলকাতা

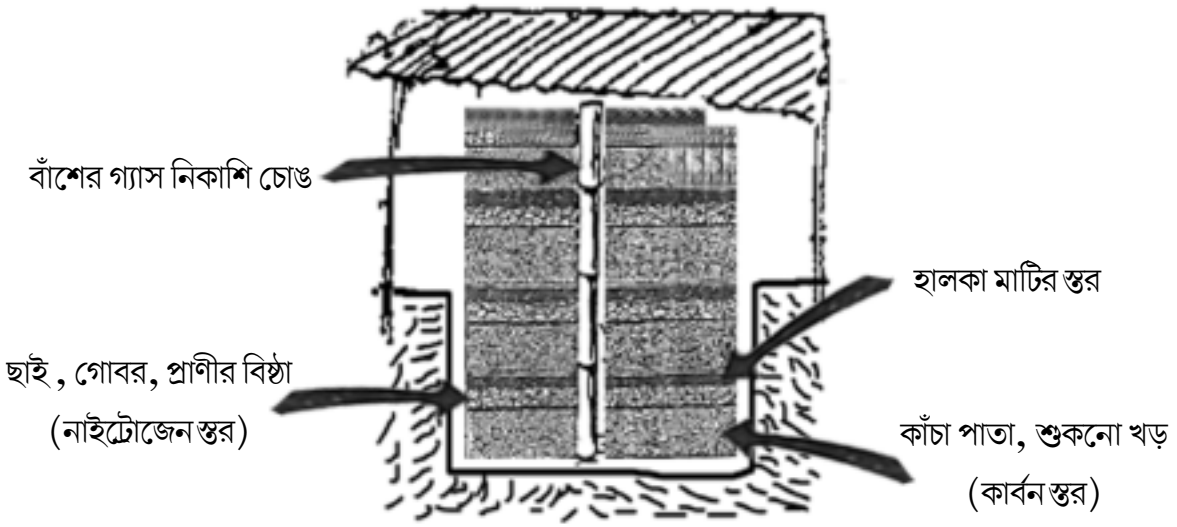

ভার্মি কম্পোস্ট বা কেঁচো সার

বিজ্ঞানী অ্যারিষ্টটল কেঁচোকে বলেছিলেন ‘ পৃথিবীর পৌষ্টিকনালী যন্ত্র’। কেঁচো গাছপালা থেকে তৈরী মৃত জৈব পদার্থ খেয়ে যে মলত্যাগ করে সেটা গাছের বা ফসলের উর্বর খাদ্যে পরিণত হয়। একটি কেঁচো তার সমান ওজনের ওই সব জৈব পদার্থ ও প্রতিদিন খেয়ে সার তৈরী করে।

চাষে কেঁচোর ভূমিকা

কেঁচোর মলে ওই জমির মাটির তুলনায় ৪-৬ গুণ বেশী নাইট্রোজেন, ৫-৭ গুণ গাছের গ্রহণযোগ্য ফসফেট (বিনিময়যোগ্য ও গ্রহণযোগ্য ফসফরাস) এবং প্রায় ১১ গুণ বেশী পটাশ যোগ হয়। এর খাদ্যনালীতে মাটির তুলনায় ৫০০-১০০০ গুণ বেশী উপকারি জীবাণু থাকে যা অল্প সময়ে জৈব পদার্থকে হিউমাসে পরিবর্তন করতে পারে। মাটিতে কেঁচোর মলমূত্র, শ্লেষ্মা মিশে মাটির অম্লতা ও ক্ষারত্বের মধ্যে একটা ভারসাম্য আনতে সাহায্য করে। কেঁচো মাটিকে ওলট পালট করে সছিদ্র করে। ফলে মাটিতে বাতাস চলাচল, মাটির কার্যকরী গভীরতা, জলধারণ ক্ষমতা ও জলনিকাশী ব্যবস্থা ভালো হয়। কেঁচো মাটিতে বসবাসকারী রোগ জীবাণু, দুষণকারী রাসায়নিক পদার্থ কমায়।

মাটির অবস্থা, চাষব্যবস্থা ও কেঁচোর সংখ্যা

মাটিতে কেঁচোর সংখ্যা কতো তা নির্ভর করে জৈব পদার্থের পরিমাণ, মাটির অম্লতা, ও ক্ষারত্বের লবনাক্ততা, জমিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক সার ও বিষের ওপর। সাধারণভাবে দেখা গেছে জৈব সার দিয়ে চাষ করলে এক একর জমিতে ২লক্ষ ১৩ হাজার থেকে ২ কোটি ৬০ লক্ষ কেঁচো থাকতে পারে। জৈব সার না দিলে সমপরিমাণ জমিতে ৮০ হাজার থেকে ৬ লক্ষের বেশী কেঁচো পাওয়া যায় না। এ থেকে বোঝা যায় কি রকম অবস্থা ও পরিবেশ কেঁচোর জন্য উপযোগী।

দেখা গেছে, যেখানে বেশ কয়েক বছর ধরে রাসায়নিক সার ও বিষ দিয়ে চাষ করা হচ্ছে সেখানে কেঁচো দেখতে পাওয়া যায় না এবং জমির মাটি শক্ত ও অগভীর হয়ে যায়। কিন্তু কয়েক বছর জমিতে রাসায়নিক সার বিষ দেওয়া বন্ধ রাখলে বা সহ্য ক্ষমতার মধ্যে ব্যবহার করলে আবার কেঁচো ফিরে আসে। মাটির গঠনও চাষবাসের পক্ষে অনুকূল হয়। শস্য পর্যায়ে ডাল চাষের অন্তর্ভুক্তি কেঁচোর সংখ্যা বাড়ায়।

চাষের জমিতে কেঁচোর বংশ বৃদ্ধি ও তাদের বসবাসের পরিবেশ তৈরী করতে হলে রাসায়নিক সার ব্যবহার কমাতে হবে, রাসায়নিক বিষ ব্যবহার বন্ধ করতে হবে ও কেঁচোর খাদ্যের উপযুক্ত জৈব পদার্থের নিয়মিত যোগান দিয়ে যেতে হবে। জমির জলনিকাশী ব্যবস্থাও ভালো হওয়া প্রয়োজন। এ ধরণের পরিবেশ বজায় রাখলে বা তৈরী করলে কেঁচো আপনা আপনিই মাটিতে ফিরে আসে।

কেঁচোর পরিবেশ

কেঁচো উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া ও ছায়াঘন পরিবেশ পছন্দ করে।

মাটিতে কেঁচো বসবাসের আদর্শ পরিবেশ হলো -

তাপমাত্রা	১৫ ডিগ্রি - ৩০ ডিগ্রি সে:
আর্দ্রতা	৬০-৭০ শতাংশ
মাটির অম্ল-ক্ষার ভারসাম্য বা PH	৭-৮.৫

যদিও এর তারতম্য কেঁচো অনেকটাই সহ্য করতে পারে।

কেঁচো পালন ও ভার্মি কম্পোস্ট বা কেঁচো সার উৎপাদন

মূল জমিতে কেঁচোর বংশবৃদ্ধি করার ব্যবস্থা নেওয়ার সাথে সাথে খুব সহজেই কেঁচো পালনের মাধ্যমে কেঁচো সার উৎপাদন করা যায়। ঘরের ভেতরে বা বাইরে বিশেষভাবে তৈরী কাঠের বাক্সে, মাটির পাত্রে বা চৌবাচ্চায় এই সার করা যেতে পারে।

সার তৈরীর উপযুক্ত কেঁচোর জাত নির্বাচন

কঠিন জৈব বর্জ্য বস্তুকে পচনের (কম্পোস্টিং) মাধ্যমে দূষণ দূর করে উৎকৃষ্ট জৈব সারে পরিণত করাই কেঁচো পালনের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সফল করতে হলে সঠিক প্রজাতির কেঁচো নির্বাচন বা সংগ্রহ করতে হবে। যেসব প্রজাতির কেঁচোর প্রধান খাদ্য জৈব বস্তু, যাদের বংশ বৃদ্ধির হার বেশী, প্রচুর পরিমাণে খায় ও মলত্যাগ করে, জৈব বস্তুর পচনের ফলে উদ্ভূত পরিবেশ ও আবহাওয়ার তারতম্য সহ্য করার ক্ষমতা যাদের বেশী সেই প্রজাতিগুলিই সংগ্রহ করতে হবে। এগুলি প্রধানত লালচে বাদামী রঙের, মুখের দিকটা লালচে, পূর্ণবয়স্ক অবস্থায় ১৫-২০ সেমি লম্বা, মুখের দিক তুলনায় ছুঁচোলো ও পেছনের দিক অপেক্ষাকৃত ভোঁতা হয়। এরা মাটির ওপরের স্তরে থাকতে ভালোবাসে। গোবর, পশুপাখীর মলমূত্র, আবর্জনা ফেলার গর্ত বা ঢিপির কাছে মাটির উপরিস্তরে এদের পাওয়া যায়।

কয়েকটি বিদেশী প্রজাতির কেঁচো (যেমন ইসিনিয়া ফয়টিডা *Eisinia foetidia* ইত্যাদি) আজকাল কোথাও কোথাও ব্যবহার হচ্ছে যাদের মধ্যে এসব গুণগুলি লক্ষ্য করা যায়। তবে দেশী জাতগুলি ব্যবহার করাই সুবিধাজনক কারণ এগুলি সহজেই পাওয়া যায়।

সার তৈরীর ক্ষমতা ও উপকরণের গুণাগুণ

বিভিন্ন প্রজাতির কেঁচোর খাদ্য গ্রহণের পরিমাণও বিভিন্ন। সাধারণত সার তৈরীর উপযোগী জাতের কেঁচো নিজের দেহের প্রতি গ্রাম ওজন পিছু ১০০-৩০০ মিলিগ্রাম খাদ্য প্রতিদিন খায়। এর মধ্যে বেশীর ভাগটাই জৈব বর্জ্য পদার্থ থাকে। দেখা গেছে ১ লক্ষ ২০ হাজারটি পূর্ণবয়স্ক কেঁচো বছরে প্রায় ১৭-২০ মেট্রিক টন জৈব পরিপাক করে সারে

চিত্র -১

পরিণত করতে পারে। নাইট্রোজেন, শর্করা ইত্যাদিতে সমৃদ্ধ জৈব বস্তু খাদ্য হিসেবে এদের পছন্দ। উদ্ভিদ অবশেষ জাতীয় খাদ্যই ওদের বেশী পছন্দ। তবে মাটিতে বসবাসকারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু এবং মাটি এরা খায়। মাছ-মাংস বা অন্যান্য আমিষ খাদ্যের অবশেষ, লেবু, টমেটো, তেঁতুল ইত্যাদি টক বস্তু, লংকা এরা পছন্দ করে না।

সারের মাধ্যম তৈরী ও কেঁচো পালন

জলদি সার উৎপাদনের জন্য দৈনন্দিন সংগ্রহ করা বা উপজাত টাটকা জৈব বর্জ্য বস্তু সরাসরি কেঁচো পালন বা সার তৈরীর জন্য দেওয়া হয় না। এগুলিকে আংশিক জৈব বিয়োজন করিয়ে (আংশিক পচিয়ে) কেঁচো পালনের খাদ্য বা মাধ্যম বা কেঁচো সার তৈরীর উপকরণ তৈরী করা হয়। আংশিক পচানোর জন্য ৩০-৩৫ দিন সময় লাগে (চিত্র -১)

মাধ্যমের উপকরণ ও তাদের মিশ্রণ

১ ভাগ মাটি, ২ভাগ কাঁচা জৈব বস্তু (পাতা, আগাছা, কচুরিপানা- শিকড় বাদ দিয়ে, গোবর বা অন্যান্য পশুপাখির মলমূত্র) ও ৩ ভাগ শুকনো খড় কুটো (ধান, গম, ডাল ইত্যাদির খড়, ভুসি, কুঁড়ো ইত্যাদি) এবং ৪০-৫০% আদ্রতা যাতে বজায় থাকে সেই পরিমাণমতো জল নিতে হবে। পাতা, খড় কুটো (বিশেষ করে শুকনো খড় কুটো) কুচিয়ে নিতে হবে। সমস্ত জৈব বস্তু ও জল সমভাবে মিশিয়ে গর্তে, পাত্রে বা ঢিপি করে কাদা দিয়ে উপরিভাগ লেপে দিতে হবে এবং ৪-৫ সপ্তাহ এ অবস্থায় পচিয়ে উল্টে পাল্টে মেশাতে হবে ও ১-২ দিন ঠান্ডা ও বাতাস খাইয়ে তবে কেঁচোর জন্য উপযুক্ত উপকরণ মাধ্যম তৈরী হবে।

আমরা উচ্চতাপ কম্পোস্ট যেভাবে তৈরী করি সার তৈরীর বিভিন্ন বস্তু স্তরে স্তরে সাজিয়েও (অর্থাৎ এক সাথে না মিশিয়ে) ৪-৫ সপ্তাহে উপকরণটি তৈরী করা যাবে। মিশ্রণে বিভিন্ন বস্তুর পরিমাণ একই হবে।

আধ পচা কম্পোস্ট মাধ্যম তৈরী হবার পর কেঁচো সার তৈরীর পদ্ধতি

চাহিদার পরিমাণ, সার তৈরীর উপাদানের মান ও পরিমাণের ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন পদ্ধতিতে কেঁচো সার উৎপাদন করা হয়।

আধ পচা কম্পোস্টে কেঁচো প্রয়োগ

মিশ্রণের পরিমাণের ওপর কেঁচোর সংখ্যা নির্ভর করে। মোটামুটি প্রতি কেজি মাধ্যমের জন্য ১০০-১৫০ টি কেঁচো দিলে ৪-৫ সপ্তাহের মধ্যে সার তৈরী হয়ে যায়।

ছোট বাগানের জন্য বা অল্প পরিমাণ কেঁচো সার নিয়মিত পাবার পদ্ধতি

মাটির বড় গামলা (মেচ্লা) অথবা কাঠের বাক্সে (প্যাকিং বাক্স) ছোট বাগানের উপযুক্ত পরিমাণে কেঁচো সার তৈরী করা যায়। পদ্ধতিটি চিত্র ১ (পৃ.২) ও চিত্র ২ ছবির সাহায্যে দেখানো হলো।

বেশী পরিমাণ সার তৈরীর পদ্ধতি

একটি ৬ ফুট লম্বা, ৫ ফুট চওড়া এবং ৩ ফুট গভীর চৌবাচ্চাতে, গর্তে বা ঢিপি করে (চিত্র ৩) প্রতি দুই মাসে ৯০০-১০০০ কেজি সার পাওয়া যেতে পারে। সার বের করে নেওয়ার পর আবার তৈরী করার জন্য ওই মাপের চৌবাচ্চায় ২০০০-২৫০০ টি মাঝারি বয়সের কেঁচো ও ডিমসহ সার মাটি মিশিয়ে দিতে হবে। মিশ্রণে গোবর গ্যাসের স্লারি পরিমাণ মতো দিলে কেঁচোর বৃদ্ধি ভালো হয়। সার তৈরীর আধ পচা কম্পোস্ট মাধ্যম চৌবাচ্চায় ভরার পর কেঁচো ছাড়ার আগে ২-৩ টি ছিদ্র যুক্ত বাঁশের চোঙ তলা পর্যন্ত খাড়াভাবে বসিয়ে দিলে জৈব পদার্থের পচনের ফলে উৎপন্ন অবশিষ্ট গ্যাস বেরিয়ে যাবার সুযোগ হয়।

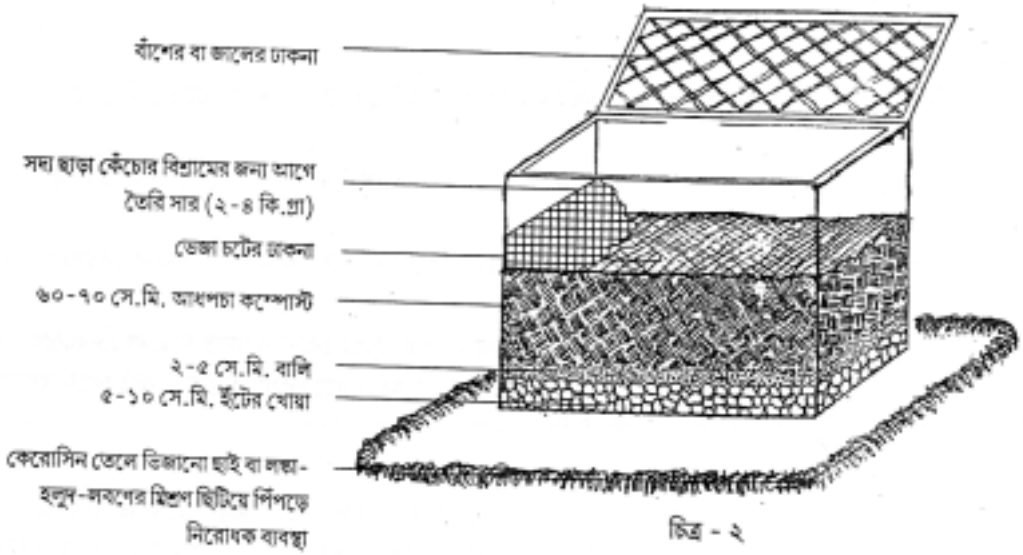

চিত্র - ২

কেঁচো সারের উপযোগিতা

মাত্র দশ লক্ষ কেঁচো ২৫ দিনে ১২০ টন জৈব পদার্থকে পচানোর মাধ্যমে সারে পরিণত করতে পারে। যে জমিতে কেঁচো নেই সেই জমির তুলনায় যে জমিতে কেঁচো আছে তার মাটিতে ৫ গুণ বেশী গাছের গ্রহণযোগ্য নাইট্রোজেন, ৭ গুণ বেশী ফসফরাস, ১১ গুণ বেশী পটাশ এবং ২ গুণ বেশী ম্যাগনেসিয়াম ও ক্যালসিয়াম পাওয়া যায়। অন্যান্য অনুখাদ্যগুলিও এদের সাথে জলে দ্রবণীয় এবং গাছের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় আসে। এছাড়া কেঁচো মাটিতে রোগ জীবাণু দমন করে ও উপকারী জীবাণু, বীজাণুদের বংশবৃদ্ধিতে সহায়তা করে। কেঁচোর নিসৃত লালা রসে এমন কিছু পদার্থ থাকে যা গাছের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে (গ্রোথ রেগুলেটর)। কেঁচো সারের মিশ্রণ দিয়ে গুটি কলম করলে বা কাটিং লাগালে তাড়াতাড়ি শিকড় গজায় ও বীজের অঙ্কুরোদগম ভালো হয়। কেঁচো জৈব পদার্থ হজম করে তার কার্বনকে কমায়, ফলে মাটিতে নাইট্রোজেনের অনুপাত বাড়ে, যা গাছের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। সার তৈরী হওয়ার পর সার ছেঁকে নেওয়ার সময় পূর্ণবয়স্ক (বড় বড়) কেঁচোগুলিকে আলাদা করে হাঁস-মুরগীর বা মাছের খাবার হিসেবে ব্যবহার করা যায়। রোদে শুকিয়ে গুঁড়ো করে বাগানের সার হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। কেঁচো ও কেঁচো ধোওয়া নির্য্যাস (ভার্মি ওয়াশ) ফসলের পাতায় স্প্রে করলে গাছের বৃদ্ধিকারক হিসেবে কাজ করে।

ব্যবহার

নার্সারি, কলম তৈরী, টবে বা মূল জমিতে কেঁচো সার স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা যায়। বিভিন্ন ফসলে যে পরিমাণে কম্পোস্ট সাধারণত ব্যবহার করা হয়, তার এক তৃতীয়াংশ কেঁচো সার ব্যবহার করলেও ভালো ফল পাওয়া যায়। কেঁচো সারের জলীয় নির্য্যাস সরাসরি গাছে স্প্রে করলে গাছ সতেজ হয়।

সতর্কতা

১) মিশ্রণে কেঁচোর খাদ্য হিসেবে পর্যাপ্ত জৈব পদার্থ সব সময় থাকতে হবে। খাবার শেষ হলেই কেঁচো পালাবার চেষ্টা করে।

২) মিশ্রণের আর্দ্রতা রক্ষার জন্য নিয়মিত জল দিতে হবে। অবশ্যই বেশী জল দেওয়া চলবে না। মোটামুটি ৬০-৭০ শতাংশ আর্দ্রতা বজায় রাখতে হবে।

৩) কেঁচো যাতে বেরিয়ে না যায় সেজন্য ঢাকনার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বাক্স বা চৌবাচ্চার দেওয়াল অনেকটা উঁচু করেও কেঁচো আটকানো যায়।

৪) তাপমাত্রা কম বেশী ২৫-৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস রাখা দরকার। ঠান্ডা থেকে বাঁচাতে বাক্স বা চৌবাচ্চার ওপরে ছাউনি ও মিশ্রণের ওপর শুকনো পাতা, খড় ইত্যাদি দিয়ে ঢাকা দেওয়া দরকার। রোদ, বৃষ্টি থেকে বাঁচাতে চালার তলায় সার তৈরী করতে হবে। ভেজা চট দিয়ে ঢেকে রাখলে ভালো হয়।

৫) রাসায়নিক সার বা ওষুধ দেওয়া চলবে না।

৬) ইঁদুর, মুরগী ও পিঁপড়ের থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করতে হবে। লংকা গুঁড়ো , হলুদ গুঁড়ো ও লবন প্রতিটি ১০০ গ্রাম করে ১০ লিটার জলে গুলে সার তৈরীর পাত্র বা চৌবাচ্চার চারপাশে ৭-১০ দিন অন্তর স্প্রে করলে পিঁপড়ের উপদ্রব কমবে। হাঁস-মুরগী, পাখির উপদ্রব থেকে বাঁচাতে বাঁশের তৈরী বরফি বেড়া বা ঢাকনা দেওয়া দরকার।

সফল উদাহরণ

২০০০-২০০১ সালে দক্ষিণ ২৪ পরগণার রায়দিঘি এলাকার নন্দকুমারপুরের সংগঠন সবুজ সংঘের চাষীর দল পরীক্ষামূলকভাবে কেঁচো সার উৎপাদন শুরু করে। বর্তমানে ৩৫ জন চাষী নিজেদের প্রয়োজনে কেঁচো সার ব্যবহার করছেন। উদ্বৃত্ত সার স্থানীয়ভাবে বিক্রিও শুরু করেছেন।

তথ্য সূত্র

১) কেঁচো পালন এবং কম্পোস্ট তৈরীর পদ্ধতি, ডব্লু ডব্লু এফ, ভারতীয় মিশন।

২) *Earthworm Resource and Vermiculture, Zoological Survey of India, 1993.*

৩) পৃথিবীর পৌষ্টিক নালী - কেঁচো, ড: মহাদেব প্রামাণিক, চাষের কথা, জানুয়ারী ১৯৯৭।

তথ্য সার্ভিস সেন্টার কলকাতা

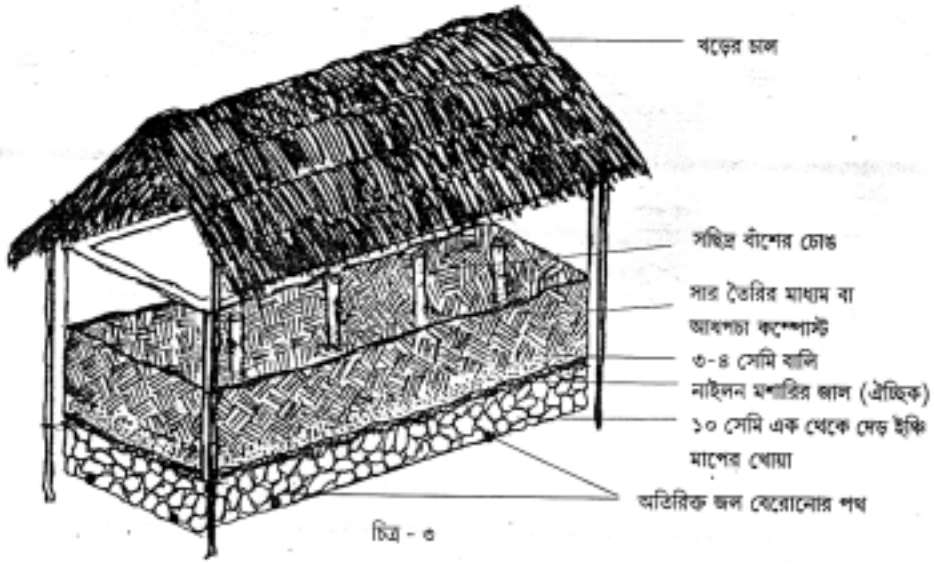

চিত্র - ৩

চৌবাচ্চায় বেশি পরিমাণ সার তৈরির পদ্ধতি

সবুজ সার

সবুজ সার কি ?

নাম থেকেই বোঝা যায় এই সার তাজা বা সবুজ উদ্ভিদ থেকে তৈরী হয় । জমিতে জৈব সার প্রয়োগের এক বিশেষ পন্থা হল সবুজ সার । সাধারণত শুঁটিজাতীয় গাছকে এবং অন্যান্য গাছকে কচি অবস্থায় (ফুল আসার মুখে) মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয় যা পচে সারে পরিণত হয় । এছাড়া শুঁটিজাতীয় গাছের সবুজ সার প্রয়োগে ৩০-৫০ শতাংশ পর্যন্ত উৎপাদন বৃদ্ধি হতে পারে।

সবুজ সার কেন ?

অন্যান্য জৈব সারের মত সবুজ সার দিয়ে মাটিতে হিউমাসের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায় ।সবুজ সার প্রয়োগে মাটিতে নাইট্রোজেন, জৈব কার্বন ও অন্যান্য সারেরও বৃদ্ধি হয়। এর প্রয়োগের ফলে মাটিতে আবদ্ধ নাইট্রোজেন ঘটিত খাদ্য ফসলের গ্রহণযোগ্য হয় । মাটিতে প্রচুর জৈব পদার্থ যোগ হওয়ায় মাটির ভৌত গুণাগুণ যেমন বায়ু চলাচল, জল ধারণ ক্ষমতা, খাদ্য যোগান দেবার ক্ষমতা বাড়ে । বিশেষত শুটিজাতীয় সবুজ সার প্রতি হেক্টরে ৫০ -১০০(বিঘায় ৬ থেকে ১৩) কেজি নাইট্রোজেন যোগান দেয় । যার ২০ -৪০ শতাংশ পরবর্তী ফসল ভোগ করার সুযোগ পায় । সবুজ সারের গাছ গুলির শিকড় মাটির গভীরে প্রবেশ করে মাটির কার্য্যকরি গভীরতা বাড়ায় - ফলে জল ধারণ ক্ষমতা, বাতাস চলাচলের ক্ষমতা এবং নীচের মাটি ব্যবহারের ক্ষমতা বাড়ায় । জমিতে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির ফলে উপকারী জীবানু, বীজাণু, কেঁচো, ইত্যাদির সংখ্যা বাড়ে।

সবুজ সার কিভাবে উৎপাদন করা হয়

সবুজ সার উৎপাদনের জন্য কাঁচা বা সজীব রসালো গাছের পাতা, ডাঁটা, শিকড় সবটাই সরাসরি জমিতে মিশিয়ে দেওয়া হয় । লাঙ্গল দিয়ে ভালভাবে মেশানোর পর মাটিতে সেচ দিয়ে ভিজিয়ে রাখতে হবে। দ্রুত পচনের পর প্রায় মাস খানেকের মধ্যে এর সুফল পাওয়া যেতে থাকে । তবে চাষের সাথে ষ্টার্টার কালচার মিশিয়ে দিয়ে পচনকে তরান্বিত করা যেতে পারে । সবুজ সারের বীজ লাগানোর সময় জমিতে রক ফসফেট দিলে ভাল ফল পাওয়া যায় । ধনচে মাটিতে মেশানোর ১৫/২০ দিনের মধ্যে ধান রোয়া ভাল । সদ্য রোয়া চারা একটু হলদেটে হয়ে যেতে পারে। তবে ক্ষতি হয় না। পচনের ফলে নাইট্রোজেনের প্রায় ৫০ শতাংশ মেশানোর ৪-৬ দিনের মধ্যে ধান গাছের নেবার উপযুক্ত হয় ও বাকিটা প্রায় ১০ দিন লাগে।

কি কি গাছ সবুজ সারের উপযুক্ত

উঁচু,শুকনো জমির জন্য - বরবটি, মুগ, মাসকলাই, শন, গুয়ার । নীচু জমির জন্য ধনচে, নীল, খেসারী, বারসীম, সেনজী ইত্যাদি । নীচু জল জমা জমি - অ্যাজোলা, নীল সবুজ শ্যাওলা, জল ধনচে । এছাড়া অন্যান্য ফসল যেমন ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা ইত্যাদি দিয়েও সবুজ সার করা যায়।

- তথ্য সার্ভিস সেন্টার কলকাতা

সবুজ পাতা সার

সবুজ পাতা সার কি ?

এটাও সবুজ সার, তবে যে জমিতে সার প্রয়োগ করা হবে সেখানে সবুজ সারের ফসল চাষ করে পরবর্তী ফসল লাগানোর অসুবিধা থাকলে (যেমন সময়ের অভাব) বিভিন্ন উপযোগী গাছের কচি ডগা সমেত পাতা সংগ্রহ করে জমির মাটিতে মিশিয়েও সবুজ সার করে নেওয়া হয়।

সুবাবুল

উপযুক্ত গাছ

গ্লিরিসিডিয়া, বকফুল, চীরল, জাম, জীবন , পলাশ, শিশু, বাবলা, মাদার ইত্যাদি।

সবুজ পাতা সার কেন?

এর উদ্দেশ্যে একই, সবুজ সারেরই মত । বিভিন্ন কারণে সবুজ সার করা সম্ভব নাও হতে পারে , যেমন সময়ের অভাব, চাষ করার উপযুক্ত পরিবেশ (মাটিতে রসের বা সেচের অভাব, সামাজিক ও ব্যবহারিক কারণে ফসল সুরক্ষার অভাব, উপযুক্ত ফসলের বীজের অভাব ইত্যাদি) এরকম ক্ষেত্রে সবুজ পাতা সংগ্রহ করে জমির মাটিতে মেশানো ও সার করে জমির উর্বরতা বাড়ানোর ব্যবস্থা করা । সবুজ পাতা সার নিয়মিত ব্যবহারে ৩০-৫০ শতাংশ পর্যন্ত উৎপাদন বাড়ানো যেতে পারে ।

সবুজ সারের গাছগুলো যেমন মাটির গভীরে শিকড় প্রবেশ করায় ও মাটির শক্ত স্তরকে ভেঙ্গে নরম করে, কিন্তু সবুজ পাতা সারের ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয় না । তবে উপরের মাটির স্তরে জৈব পদার্থের প্রভাবে মাটির জল ধারণ ক্ষমতা ও বায়ু চলাচলের বাতাবরণ তৈরি হয় ।

কিভাবে করা হবে

কচি ডগা ও পাতা জমি চাষ করার সময় জমিতে দিয়ে চাষের সাথে মেশাতে হবে । তাড়াতাড়ি পচানোর জন্য মাটি কাদা করে মই দিয়ে চেপে দিতে হবে । এক্ষেত্রে বিঘা প্রতি (৩৩ শতক) তিন-চার হাজার কেজি সবুজ পাতা মেশাতে পারলে সবুজ সারের মতই ফল পাওয়া যায় ।

সবুজ পাতা উপলব্ধ করার উদ্দেশ্যে বিশেষত শুকনো অঞ্চলে অ্যালিক্রপিং করা হয় যাতে সারা বছর সবুজ পাতা পাওয়া যায় । এছাড়া আলে সবুজ সারের গাছ লাগিয়ে সারা বছর সবুজ পাতা সার পাওয়া যায়। সামাজিক ও কৃষি ভিত্তিক বন সৃজনে গাছ নির্বাচন করার সময় সবুজ পাতা সার হয় এমন গাছ লাগানো প্রয়োজন ।

সতর্কতা

যে সবুজ পাতা ও ডগা দেওয়া হবে সেটা যেন কচি ও রসালো হয় যাতে সহজে পচে । মাটিতে মেশানোর সময় মাটিতে যাতে রসের বা জলের অভাব না থাকে তাই বর্ষাকালে করা ভাল । যেসব পাতা দেরীতে পচে যেমন বাঁশ, আম, ইউক্যালিপটাস, আকাশমনি, ঝাউ ইত্যাদি না ব্যবহার করাই ভাল। *- তথ্য সার্ভিস সেন্টার কলকাতা*

◀ গ্লিরিসিডিয়া

মিনজিরি ▶

গোবর গ্যাস স্লারি

কি ? ও কেন ?

বায়োগ্যাস বা গোবর গ্যাস উৎপাদন যন্ত্র থেকে যে জলীয় পরিত্যক্ত পদার্থ বেরিয়ে আসে তাকে স্লারি বা গোলাসার সার বলে যা সার হিসাবে ব্যবহার হয় । প্রচলিত পদ্ধতিতে গোবর, পশুপাখীর মলমূত্র, আর্বজনা থেকে কম্পোষ্ট সার তৈরী করতে প্রায় ছয়মাস সময় লাগে । আর এই দীর্ঘ্য সময়ে উপস্থিত সার বস্তুর (গাছের খাদ্য উপাদান) উল্লেখযোগ্য পরিমাণ নষ্ট হয়ে যায় । তাই এইসব জৈবপদার্থগুলোকে গোবর বা বায়োগ্যাস তৈরীর যন্ত্রে পরিপাকের মাধ্যমে বিজারিত করে আরও কার্য্যকরী বা উন্নত সার পাওয়া সম্ভব । বিজারনের ফলে এই জৈব বর্জ্য পদার্থ থেকে যেমন শুদ্ধ জ্বালানী গ্যাস (বায়োগ্যাস) রান্নার কাজের জন্য পাওয়া যায়, তেমনি পড়ে থাকা জৈব পদার্থের অবশেষ (যেটা জৈবসার হিসাবে ব্যবহার হয়) স্লারি-তাতে সার বস্তুগুলোও অনেক বেশি পরিমানে বজায় থাকে । উদাহরণ থেকে বোঝা যাবে :

(পরিমাণ শতাংশ)

	নাইট্রোজেন	ফসফেট	পটাশ অংশ	জৈববস্তু	জল	জৈব কার্বন	কার্বন ঃ নাইট্রোজনের অনুপাত
গোবরসার কম্পোষ্ট	০.৫৫	০.৫৮	০.৪১	৩৫.২৪	৪১.১২	১৯.৫৮	৩৬ঃ১
স্লারি	১.৫-৩.৫	১১-২.০	০৮.১.১	৬৬.৫	৯৫	৩৪-৪২	১২ঃ১

এছাড়া স্লারিতে অণুখাদ্যগুলো যেমন দস্তা, তামা , ম্যাঙ্গানীজ, লৌহ ইত্যাদি বেশি পরিমানে গাছের লভ্য অবস্থায় থাকে । জৈব পদার্থের পরিমাণ বেশি থাকায় মাটিতে বসবাসকারী উপকারী জীবাণু, অণুজীবগুলো বেশি পরিমাণ খাদ্য পায় । কার্বন-নাইট্রোজেনের অণুপাত সংক্ষীর্ণ হওয়ায় গাছ বা ফসলের জন্য নাইট্রোজেন বেশি পরিমান সহজলভ্য হয়। এছাড়া এতে আগাছার বীজগুলো নষ্ট হয়ে যায় ফলে মূলজমিতে আগাছা কম হয়।

ব্যবহার

বায়োগ্যাস যন্ত্র বা প্ল্যান্ট থেকে পাওয়া স্লারি বা সারে যে নাইট্রোজেন থাকে তার ১০-১৫ ভাগ এ্যামোনিয়ারূপে থাকে । গলা বা ভেজা অবস্থায় সরাসরি এই সার প্রয়োগে ফসলের ক্ষতি হতে পারে। (ধানে পরিমানমত ব্যবহারে ক্ষতি হবার সম্ভবনা কম)। এজন্য ছায়ায় শুকিয়ে প্রয়োগ করাই ভাল । এতে নাইট্রোজেনের পরিমান কমে ১.৮-২ ভাগ হবে। আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষায় দেখা গেছে - হেক্টরে (২৫০শতক) দশহাজার কেজি স্লারির সাথে এ্যাজোস্পিরিলাম ও ফসফো ব্যাক্টেরিয়া প্রয়োগে ধানের উৎপাদন ২৭% পর্যন্ত বাড়ানো গেছে (কেবলমাত্র - নাইট্রোজেন,ফসফেট ও পটাশ সুপারিশমত ব্যবহারের তুলনায়)। এইভাবে স্লারির ব্যবহার ধানের ক্ষেত্রে করার পর দ্বিতীয় ফসল বিউলির উৎপাদন ১৭% পর্যন্ত বৃদ্ধি করা গেছে ।

শুকানোর ফলে এ্যামোনিয়া উবে গিয়ে যে ক্ষতি হয় সেটা বাঁচানোর জন্য অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বিশেষ পদ্ধতির সুপারিশ করা হয়েছে ।

ক) টাটকা স্লারির সাথে সমপরিমান জল মিশিয়ে পাতলা করে নিয়ে তার সাথে ২% হারে এ্যাজোস্পিরিলাম,

ফসফো ব্যাক্টেরিয়া এবং দস্তার লবন (জিংক সালফেট) মিশিয়ে ধানের চারার শিকড় ডুবিয়ে নিয়ে রোপন করা যায়। আন্নামালাই কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় দেখা গেছে এতে ৬% পর্যন্ত ধানের উৎপাদন বেড়েছে।

খ) টাটকা স্লারির সাথে ২% হারে এ্যাজোস্পিরিলাম, ফসফো ব্যাক্টেরিয়া এবং দস্তার লবন মিশিয়ে বীজের সাথে মাখিয়ে নেওয়া যায়। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় দেখা গেছে -ধানের ক্ষেত্রে ৬% এবং জোয়ারের ক্ষেত্রে ১৫% উৎপাদন বেড়েছে।

যেখানে সবার বায়োগ্যাস উৎপাদন ব্যবস্থা নেই বা স্লারি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাবেনা সেখানে উপরে বলা ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।আবর্জনা কম্পোষ্ট তৈরীর সময় টাটকা স্লারি মিশিয়ে নিলে উৎপাদিত কম্পোষ্টের মান অনেক উন্নত হয় এবং তাড়াতাড়ি সারে পরিণত হয়।

স্লারির মান উন্নয়ন

খুব সহজেই এর মান উন্নত করা যায়। টাটকা স্লারির সাথে সুপারিশকৃত পরিমান রক ফসফেট বা সুপার ফসফেট মিশিয়ে গাদা করে রাখলে ৩০দিনের মধ্যে উন্নত সার তৈরী হয়। এতে ফসফেট বেশি মাত্রায় সহজলোভ্য হয়। দেখা গেছে এভাবে উন্নত স্লারি প্রয়োগে ধানের উৎপাদন ৮-১০% বৃদ্ধি পেয়েছে।

সতর্কতা

টাটকা স্লারি ধান ছাড়া অন্য ফসলে দেওয়া উচিৎনয়। ছায়ায় ১০-২৫ দিন শুকিয়ে দেওয়া ভাল।

সূত্র : জয়বল ও কুপুস্বামী, আন্নামালাই কৃষিবিশ্ববিদ্যালয়, দি হিন্দু, ১৮ই জুন ১৯৯৮ ইং

এজোলা
দিয়ে ধান ক্ষেতে উর্বরতা বাড়ান

এজোলা কি ও কেন ব্যবহার করব :

- এজোলা একটি খুব ছোট পানা যা সপ্তাহে দ্বিগুণ বাড়ে আর অল্প ফসফেট দিলে ৪ গুণও বৃদ্ধি হয়ে থাকে।
- এজোলার পাতায় অ্যানাবিনা এজোলা নামে নীল সবুজ শ্যাওলা বাস করে, যা বাতাসের নাইট্রোজেন থেকে সার তৈরি করতে পারে। এক বিঘে এজোলা পূর্ণ জমিতে দিনে ২ কিলো ইউরিয়ার সমান নাইট্রোজেন সংযোজন হয়।
- যদিও ১০০ কিলো এজোলা শুকোলে ৫ কিলো দাঁড়ায়, শুকনো এজোলায় শতকরা ৪ ভাগ নাইট্রোজেন, প্রায় ১ ভাগ ফসফরাস ও ২-৫ ভাগ পটাশিয়াম থাকে ও প্রচুর জৈব কার্বন পদার্থ থাকে। এই জৈব কার্বন মাটিকে জীবন দান কারী জীবাণুর খাদ্য।
- সবচেয়ে বড় কথা, প্রচুর পরিমাণে সবুজ সারের দরুন জমি জীবন্ত হয়ে ওঠে - সজীবতা ও প্রাণ ফিরে আসে।

সার হিসেবে ব্যবহার

- জমিতে জল দাঁড়িয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই কাদা করে এজোলা ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত।
- সঠিক আবহাওয়ায় ৫ কিলো এজোলা ১০০ দিনে ২০০ কুইন্টালও হতে পারে।
- ধানের ক্ষেতে এজোলার উপকার পেতে গেলে, রোপণ ও নিড়ানের সময় মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে সিকি ভাগ এজোলা ভেসে থাকে - আবার বেড়ে ওঠার জন্য।
- যেখানে কেবল রোপণের সময়ই এজোলা ছড়ানো সম্ভব, সেখানে এজোলার উপকার ধানে ও বাকিটা পরবর্তি ফসলের কাজে লাগে।

এজোলা চাষের কিছু শর্ত

- এজোলা একটি জলজ পানা তাই জল কাদা অতি জরুরী।
- যদিও সাধারণভাবে এজোলার বাড় যথেষ্ট, তবে বিঘা প্রতি ৫ কিলো হাড়গুঁড়ো অথবা রক ফসফেট দিতে পারলে এর বৃদ্ধির হার দ্বিগুণ হতে পারে।
- এজোলার বৃদ্ধির হার অত্যাধিক গরমে কমে যায়, রং লালচে হয়ে যায় ও রোগ পোকার সমস্যাও দেখা দেয়।
- আধো ছায়াতে, জলের অম্লতা ৪-৭পি. এইচ এবং যথেষ্ট আর্দ্রতাতে ভাল হয়। এজোলার বিভিন্ন জাত আছে। তাই স্থানীয় পরিবেশে স্থানীয় এজোলার জাত ব্যবহার করাই বাঞ্ছনীয়।
- একটু ছায়াযুক্ত ডোবা, ম্যাসলা বা চৌবাচ্চাতেও এজোলা বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব।

এজোলার আরও কিছু গুণ ও ব্যবহার

- এজোলা জমি ও জলকে যেহেতু ঢেকে রাখে, তাই ধান ক্ষেতে আগাছা কম হয় এবং জলেরও সাশ্রয় হয় ।
- এজোলা থেকে জমি নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ ছাড়া জৈব কার্বন ও অন্যান্য অণুখাদ্যও পায় ।
- এজোলা দিয়ে ভাল কম্পোষ্ট তৈরি হয় । আর এর থেকে হাঁস, মুরগী, শুয়োরের ও গরুর এবং মাছের পুষ্টিকর খাবার হয়।
- এজোলার চাষ নতুন কিছু নয় । বহুদিন ধরেই চিন, ভিয়েতনাম ও অন্যান্য দেশে এর ব্যবহার হয়ে আসছে। আমাদের দেশের জলা, ধানজমিতে প্রাকৃতিক ভাবেই জন্মায় ।

- তথ্য সার্ভিস সেন্টার কলকাতা

ধান জমির আলে সবুজ পাতা সার - গ্লিরিসিডিয়া গাছ

আলে সবুজ পাতা সারের গাছ

গ্লিরিসিডিয়া, বকফুল, বাবলা, মাদার ইত্যাদি।

উঁচুমানের কম্পোস্ট - ফসফো কম্পোস্ট

রাসায়নিক সার অতিরিক্ত ও অসম ব্যবহারে চাষের জমি তার নিজস্ব উর্বরতা অনেকটাই হারিয়েছে। জমির প্রাণশক্তি তলানীতে ঠেকেছে। হারিয়ে ফেলা উৎপাদন ক্ষমতা ফিরিয়ে আনতে এবং যা আছে তা ধরে রাখতে বেশী বেশী করে জৈব সারের ব্যবহার বাড়াতে হবে। একই সাথে কমাতে হবে অসম ও অতিরিক্ত রাসায়নিক সারের ব্যবহার। আপাত কঠিন কাজটা সহজেই করা যায় যদি বাড়িতেই সবুজ সার, কম্পোস্ট, **ফসফো-কম্পোস্ট** তৈরী করে জমিতে দেওয়া যায়।

ফসফো কম্পোস্ট কি?

আমরা চাষবাস ও গাছ গাছালীর আবর্জনা, গোবর, বাড়ি ঘরের ঝাট দেওয়া আবর্জনা, পশুপাখির মলমূত্র পচিয়ে সার বানালে তাকে কম্পোস্ট সার বলি। আর ঐ কম্পোস্ট বিশেষ অথচ সহজভাবে রক ফসফেট (ফসফেট সারের প্রাকৃতিক উপাদান), পাইরাইট (সালফার সমৃদ্ধ লৌহআকর), ইউরিয়া, জীবাণু সহযোগে বানালে তাকে বলি ফসফো কম্পোস্ট।

ফসফো কম্পোস্ট কমবেশী ৫০০ কেজি তৈরীর জন্য কি কি জিনিস এবং কি পরিমাণে লাগবে?

- শুকনো জৈব আবর্জনা- (খড়, সরষে,ভুট্টা ইত্যাদির কাঠি, ঝড়া পাতা ইত্যাদি) ৩৪০ কেজি
- কাঁচা জৈব আবর্জনা- (আগাছা, গাছের পাতা, কচুরী পানা ইত্যাদি) ৪০০ কেজি
- কাঁচা গোবর- ২৫০ কেজি
- গোবর সার বা কম্পোস্ট সার- (এর মধ্যে মজুত জীবাণু পচনে সাহায্য করে) ২৫ কেজি
- মাটি- ২৫ কেজি
- রক্ ফসফেট (না পাওয়া গেলে সিঙ্গল সুপার ফসফেট)- ৫০ কেজি
- পাইরাইট (না পাওয়া গেলে সিঙ্গল সুপার ফসফেট)- ২০ কেজি
- ইউরিয়া- ১০ কেজি
- পচনকারী জীবাণু- (ডিকম্পোসার ব্যাক্টেরিয়া কালচার) ২৫০ গ্রাম

ফসফো কম্পোস্ট তৈরীর পদ্ধতি -

এটি বানানোর পদ্ধতি খুবই সহজ ও সরল। জল জমে না, দিনের বেশীরভাগ সময় রোদ পায় এমন জায়গা বাছতে হবে। প্রথমে জৈব ও অজৈব প্রতিটি জিনিসই ৭-৮ ভাগে ভাগ করে নিতে হবে। এবার চার হাত চওড়া এবং পাঁচ হাত লম্বা জায়গায় ছেড়া পলিথিন বা সারের বস্তা বিছিয়ে দিতে হবে, শান বাঁধানো হলে ভালো। এখন শুকনো জৈব বস্তুর একটি ভাগ ঐ পলিথিনের উপরে বিছিয়ে দিতে হবে। এটি কমবেশী ৮-১০ ইঞ্চি উঁচু হবে। এবার সবুজ জৈব বস্তুরও একটি অংশ বিছাতে হবে(শুকনো ও কাঁচা জৈব বস্তু একসাথে মিশিয়ে দিতে পাড়লে ভালো)। এর পর কাঁচা গোবর, মাটি ও গোবর সার বা কম্পোস্টের এক একটি ভাগ একসাথে জলে গুলে ছিটিয়ে দিতে হবে। এখন এর উপরে ইউরিয়া ও জীবাণু গোলা জল ছড়াতে হবে। জীবাণু না পেলে কেবল ইউরিয়াই জলে গুলে ছড়াতে হবে। তারপর রক ফসফেট ও পাইরাইটের একেকটি অংশ সমভাবে বিছিয়ে দিতে হবে। পূনরায় শুকনো জৈব বস্তু থেকে শুরু করে ইউরিয়া ও জীবাণু জলে গুলে ছিটিয়ে পরপর ৭-৮টি স্তরে চেপেচেপে সাজিয়ে স্তুপ বানাতে হবে। তারপর স্তুপটির মাটি ও গোবর জলের কাদা করে লেপে দিতে হবে। এখন পলিথিন চাঁদর দিয়ে স্তুপটি পুরোপুরি ঢেকে দিতে

হবে। যাতে জল না শুকোয় এবং বাইরের জল না ঢুকতে পারে। এক মাস বাদে পলিথিনের চাঁদর সরিয়ে স্তুপটি উল্টে পাল্টে প্রয়োজন মত জল দিয়ে ভিজিয়ে আবার স্তুপ আকারে সাজিয়ে ঐ পলিথিন চাঁদর দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। দুই থেকে আড়াই মাস বাদে জমিতে ব্যবহার উপযুক্ত উন্নতমানের ফসফো কম্পোস্ট তৈরী হবে।

ফসফো কম্পোস্টের গুণগত মান:

সাধারণত: এই সারে শতকরা ২-৩ ভাগ নাইট্রোজেন, ৩.২-৪.৮ ভাগ ফসফোরাস ১.৮-২.৬ ভাগ পটাশিয়াম ও ১.৫-২.০ ভাগ সালফার ও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফসলের প্রয়োজনীয় অনুখাদ্যগুলি গাছের বা ফসলের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় পাওয়া যায়। অর্থাৎ প্রতি ১০০ কেজি ফসফো কম্পোস্ট সারে ৪.৫-৬.৫ কেজি ইউরিয়া, ২০-২৫ কেজি সিঙ্গল সুপার ফসফেট ও ৩-৪.৫কেজি মিউরেট অব পটাশ ছাড়াও প্রয়োজনীয় সালফার ও অনুখাদ্য পাওয়া যায়। সাথে থাকে প্রচুর জৈব কার্বন যা মাটির উপকারী জীবাণুদের প্রয়োজনীয় খাদ্য। এর ব্যবহারে মাটি জীবন্ত হয়ে ওঠে। এই কম্পোস্ট উৎপাদনের সময় প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয়। এই তাপে জৈব পদার্থে বিভিন্ন আগাছার বীজ এবং ক্ষতিকারক জীবাণু কমে যায়।

তথ্য: ড: নীহারেন্দু সাহা, বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

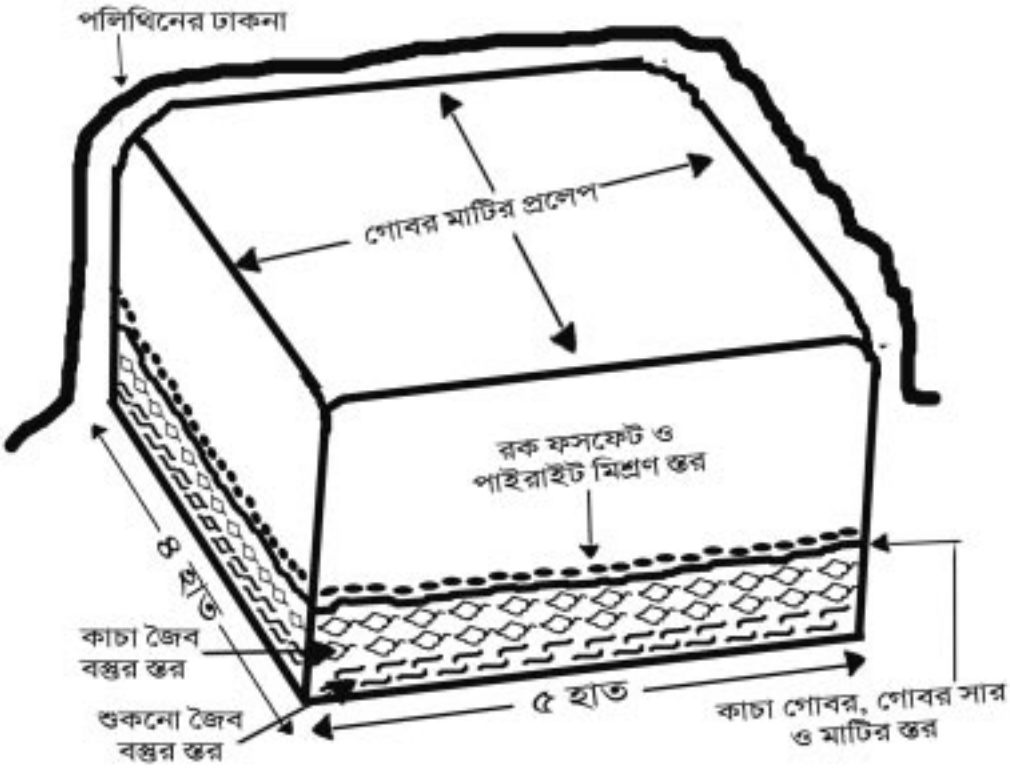

সার বস্তু সাজানো প্রথম স্তর দেখানো হয়েছে

৭৩ তম সংবিধান সংশোধনীর শক্তিতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কম বেশী সব জায়গাতেই ধীরে ধীরে স্থায়ী স্থান করে নিচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত আইন ১৯৭৩ সংশোধন করে তৃণমূল স্তরে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের প্রক্রিয়া দানা বেঁধে উঠছে। গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন করে এবং তাদের উদ্যোগে স্বনির্ভর দল গড়ে সার্বিক গ্রাম উন্নয়নের কাজে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবিকা, পরিবেশ, সংস্কৃতি সহ ... জীবন ধারণ ও জীবন যাপনের সকল ক্ষেত্রেই গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমেই এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে স্থানীয় চাহিদা, দক্ষতা ও বিকেন্দ্রীকৃত প্রাকৃতিক সম্পদ নির্ভর জীবিকা বিকাশের সুযোগ আছে ও এসেছে। এই কাজে সহজ, পরিবেশমুখী লোকায়ত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি তৃণমূল স্তরে পৌঁছে দিতে লোক কল্যাণ পরিষদ বদ্ধ পরিকর। স্বশাসনের সহায়তা কেন্দ্র হিসাবে লোক কল্যাণ পরিষদের সকল প্রকাশনাই আপামোর জনসাধারণের ক্ষমতা, শক্তি ও জীবনের মানের সমৃদ্ধি ঘটাবে এটাই লক্ষ্য। এই প্রকাশনাটি সেই পথে চলার একটি পাথেয় মাত্র।

লোক কল্যাণ পরিষদ

২৮/৮, লাইব্রেরী রোড, কলকাতা- ৭০০ ০২৬

☎ ২৪৬৫-৭১০৭, ৫৫২৯-১৮৭৮